উদাহরণ হিসাবে 'পঞ্জাবী সুবা' আন্দোলনের কথা বলা যায়। এই আন্দোলন আপাত বিচারে অ-সাম্প্রদায়িক। এ হল একটি ভাষা-আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তি অতি মাত্রায় সক্রিয় ছিল।

সাম্প্রদায়িকতার ধারণা // বিপান চন্দ্র তাঁর *Communalism in Modern India* শীর্ষক গ্রন্থে সাম্প্র-দায়িকতা সম্পর্কে অর্থবহ আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে সাম্প্রদায়িকতার ধারণা একটি বিশেষ বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্বাস অনুসারে বলা হয় যে বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্যই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক। এই ধর্মীয় পার্থক্যই জনসম্প্রদায়সমূহের ভিতরকার অন্যান্য পার্থক্যকে ছাড়িয়ে যায়। হিন্দু, মুসলমান ও শিখরা হল স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী জনসম্প্রদায়। স্বভাবতই তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক স্বার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বৈপরীত্যযুক্ত। অর্থাৎ একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর লাভ, অপর একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর ক্ষতি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। মনে করা হয় যে, একটি ধর্মীয় জনসম্প্রদায় সব সময় অন্য ধর্মীয় জনসম্প্রদায়ের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থার ক্ষতি সাধন করে নিজের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করে। বিপান চন্দ্রের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে ধর্মীয় জনসম্প্রদায়গুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতাই হল সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতার মতাদর্শ অনুসারে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এবং এই সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠীগত স্বার্থের বিরোধিতা বর্তমান থাকে। এই কারণে দেখা যায় যে মুসলমান কোন জননেতা সংসদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হলে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টিকে মুসলমান জনসম্প্রদায়ের লাভ এবং অন্যান্য জনসম্প্রদায়ের ক্ষতি হিসাবে দেখা হয়। কারণ মুসলমান সাংসদটিকে কেবলমাত্র মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে দেখা হয়। বিপান চন্দ্র বলেছেন: "The concept of communalism is based on the belief that religious distinction is the most important and fundamental distinction, and this distinction overrides all other distinctions. Since Hindus, Muslims and Sikhs are different religious entities, their social economic, cultural and political interests are also dissimilar and divergent. As such the loss of one religious group is the gain of another group and vice-versa. If a particular community seeks to better its social and economic interests, it is doing at the expense of the other."

সাম্প্রদায়িকতার ধারণার মধ্যে রাজনীতিক ব্যঞ্জনাও বর্তমান। সাম্প্রদায়িকতার ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে রাজনীতিক আনুগত্যের বিষয়টি জাতি-রাষ্ট্রের পরিবর্তে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সাম্প্রদায়িকতা ব্যক্তিমানুষের মানবিক মূল্যবোধকে শিথিল করে দেয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক জীবনধারাকে বিপন্ন করে তোলে। সাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় ভিত্তিতে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভেদ ও বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করে। ভারতে বহুজাতির, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করে। এ রকম একটি সাম্প্রদায়িকতা হল জাতীয় সংহতির বিরোধী। সাম্প্রদায়িকতা মানুষের মধ্যে একটা ভ্রান্ত চেতনা বা উন্মাদনার সৃষ্টি করে। এবং এই চেতনা ধর্মবৈষম্য-মূলক সমাজে শ্রেণীচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণ-বঞ্চনা বাড়তে থাকে, কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে। সমাজে শোষণ-পীড়ন ও অন্যায়-অবিচার বাড়তে থাকে। দেশ ও দেশবাসীর সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমাজ-সভ্যতার বিকাশ ব্যাহত হয়।

৪১.৫ ভারতীয় জনজীবনে সাম্প্রদায়িকতা (Communalism in India)

ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ // ভারতের একদল মানুষের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হল ভারত বিভাগের ঘটনা। আশা করা হয়েছিল যে ...

তালিকায় জায়গা দেওয়া

৪১.৬ ভারতে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ (Origin and Expansion of Communa-lism in India)

ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে স্বাধীনতার অনেক আগে। ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম বিখ্যাত ব্রিটিশ নীতি ছিল 'বিভাজন ও শাসন'(Divide and Rule)। সাম্প্রদায়িকতা হল এই ব্রিটিশ নীতিরই অপরিহার্য অঙ্গ। ঐতিহাসিকদের অনেকের অভিমত অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ হল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান একযোগে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে ইংরেজরাও কিছু এদেশীয় শক্তির সাহায্য পেয়েছিল। কাশ্মীর, জয়পুর, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদের মত দেশীয় নৃপতি-শাসিত বড় রাজ্য এবং কিছু ছোট রাজ্য বিদেশী ব্রিটিশ শক্তির পাশে দাঁড়িয়েছিল। তা ছাড়া শিখ ও গোর্খাদের মত কিছু সম্প্রদায়ও ইংরেজ শাসকদের সাহায্য করেছিল। তারফলে বিদ্রোহীরা পদানত হয়, বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ শাসকরা সফলকাম হয়। অতঃপর ব্রিটিশ শাসকরা ভারত শাসনের ক্ষেত্রে 'বিভাজন ও শাসন' নীতির তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে। তারা হিন্দু ও মুসলমান ভারতের এই দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ বাধিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে ব্রিটিশ সরকার মূলত মুসলমানদের বিদ্রোহ হিসাবে ধরে নিয়েছিল। মুঘল জমানার পুনরুত্থানের অভিপ্রায়ে মুসলমানরা এই আন্দোলনের সামিল হয়েছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জাতক্রোধ বরাবরই আছে। এরকম একটা ধারণা এ দেশের ইংরেজ সরকারের ছিল। এই কারণে ব্রিটিশ সরকার দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানদের বিশ্বাস করত না; সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যের ব্যাপারে ইংরেজরা সতত সন্দিহান ছিল। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণেই ব্রিটিশ সরকার যথাসম্ভব মুসলমানদের সরকারী চাকরির বাইরে রেখেছে। বাংলা সরকারের ১৮৭১ সালের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, মোট নিযুক্ত সরকারী চাকরিজীবীর সংখ্যা ছিল দু'হাজার একশ' একচল্লিশ। তারমধ্যে এক হাজার তিনশ' আটত্রিশ জন ছিল ইউরোপীয়, সাতশ' এগার জন হিন্দু এবং মাত্র বিরানব্বই জন মুসলমান। বিবিধ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত মুসলমানদের মধ্যেও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল। দীর্ঘদিন এই অবস্থা অব্যাহত থাকে।

রাজনীতিক ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের আবির্ভাবের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। বৈষয়িক সমৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যাবতীয় সংস্কারের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে পশ্চিমী শিক্ষা-দীক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য তিনি মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করেন। এই উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান আলীগড়ে মহমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই কলেজই আলীগড় মুসলিম য়ুনিভর্সিটি-তে পরিণত হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সাম্প্রদায়িক নামে চিহ্নিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি যাবতীয় জাতীয়তা-বিরোধী কার্যকলাপের কেন্দ্রে এবং মৌলবাদীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

লর্ড মিন্টো ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। বাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন উজ্জীবিত, তখনই মিন্টো হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের তাতিয়ে দেওয়ার জন্য তৎপর হন। এই উদ্দেশ্যে ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত সচিব স্মিথ সাহেব মহমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের সেক্রেটারির উদ্দেশ্যে একটি পত্র পাঠান। এই পত্রে বলা হয় যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া বিচার-বিবেচনা

Scanned with CamScanner

করার জন্য মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে ভাইসরয় আগ্রহী। কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড (Archbold) পত্রটি সত্বর কলেজের সেক্রেটারি নবাব মসিন-উল-মুল্ক-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। শুধু তাই নয় সাম্প্রদায়িক মনোনয়ন ও প্রতিনিধিত্বের দাবি উত্থাপনের জন্য অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড সেক্রেটারি মশিন-উল-মুল্ক-কে পরামর্শ প্রদান করেন। এমন কি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় খসড়াও তিনি তৈরী করে দেন। নবাব মশিন-উল-মুল্ক স্যার আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল গঠন করেন। এই প্রতিনিধি দল মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে বিবিধ রাজনীতিক ও প্রশাসনিক দাবি-দাওয়া ভাইসরয়ের কাছে পেশ করে। এই সমস্ত দাবি-দাওয়ার প্রতি লর্ড মিন্টো সহানুভূতিসূচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। তিনি বলেন: "The pith of your address, as I understand it, is a claim that in any system of representation, whether it affects a Municipality, a District Board or a Legislature in which it is proposed to introduce or to increase the electoral organisation, the Mohammadan community should be represented as a body. You justly claimed that your position should be estimated not merely on your numerical strength but in respect of the political importance of your community and the service that it has rendered the Empire."

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটিশ আমলে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় ব্রিটিশ আমলেই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সময় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। তার ফলে শাসনব্যবস্থায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব ঘটে। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার ও ভারতীয় পরিষদ আইনের মাধ্যমে সমকালীন ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। মর্লি-মিন্টো চক্রান্তের পরিধি অধিকতর প্রসারিত হয় মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট ও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে। এই আইনে ধর্মীয় সম্প্রদায় ও শ্রেণীর ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে এ দেশের মুসলমান ও অ-মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা অধিকতর শক্তিশালী হয়। এই আইনে মুসলমান ছাড়াও শিখ, আংলো ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয় ও ভারতীয় খ্রীস্টানদের জন্যও স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়।

সাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধি সাম্প্রদায়িকতা ভারতের ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে মেরুপ্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়। ভারতের জনজীবনে যুক্তি, বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়নীতির নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এদেশের কোন কোন রাজনীতিক দলের ভূমিকাও সাম্প্রদায়িকতার সহায়ক। আসগর আলী ইন্‌জিনীয়ার (A. A. Engineer)-এর অভিমত অনুসারে ভারতীয়রা সাম্প্রদায়িকতার থেকে অধিকতর ধর্মবোধসম্পন্ন, বিপরীতক্রমে দেশের নেতারা হলেন ধর্মবোধের থেকে অধিকতর সাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন। স্বভাবতই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা বিশেষভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ধর্মীয় মৌলবাদ বা মতান্ধতা ক্ষেত্রবিশেষে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে রাজনীতিক কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত করা হচ্ছে। বেশ কিছু রাজনীতিক দলের কার্যকলাপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতির চেতনা বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ রাজনীতিক দলও অতিমাত্রায় সক্রিয়।

স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিশাল এই ভারতে সংখ্যালঘু বহু জনসম্প্রদায় বসবাস করে। স্বভাবতই সাম্প্রদায়িকতা ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় একটি বড় বিপদ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর আজ পর্যন্ত ন' হাজারেরও অধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭৮ এই সময়ের মধ্যে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্বাভাবিক জনজীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। এই সময়কালের মধ্যে প্রতি বছরই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধেছে। এবং প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে বছর পিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একশ' সত্তর বারেরও বেশী সংঘটিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোটখাট নগণ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। এ রকম ঘটার উদাহরণ হিসাবে কোন মসজিদের পাশ দিয়ে হিন্দুদের কোন মিছিল যাওয়া, হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলমান পুরুষের বা মুসলমান মেয়ের সঙ্গে হিন্দু পুরুষের প্রণয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ জাতীয় স্পর্শকাতর কোন ঘটনার পর সাধারণত তড়িৎ গতিতে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ে, ধর্মীয় নেতারা মৌলবাদী মৌলবীরা জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় দুটির মধ্যে রক্তাক্ত সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সরকার তার শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে হস্তক্ষেপ করলে পীড়নমূলক পুলিশী কার্যকলাপের অভিযোগ উঠে। আর এক প্রস্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। বিবদমান সম্প্রদায় দুটি এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসে। স্বাভাবিক জীবন ধারা আবার ফিরে আসে।

Scanned with CamScanner

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ ∫∫ বিভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিব্যক্তি ঘটে। ধর্মীয় কাঠামোর ধ্বংস সাধন, ধর্মীয় সংগঠন-প্রতিষ্ঠানের ঘর-বাড়ি বলপূর্বক দখল বা অগ্নি সংযোগকরণ প্রভৃতি কাজকর্মের মাধ্যমেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নগ্ন প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮৪ সালে পঞ্জাবে কিছু মন্দির এবং হরিয়ানায় কিছু গুরুদ্বারা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এর আগেও এ রকম ঘটনা ঘটেছে। ১৯৭৯ সালে ভুট্টো অনুগামীদের আন্দোলনে শ্রীনগরে বেশ কিছু গীর্জা বা চার্চ পোড়ার ঘটনা ঘটেছে। চার্চ-বিরোধী এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল যে ভুট্টোকে যখন ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয়, তখন ফাঁসুড়ে হিসাবে কাজ করেছিলেন একজন খ্রীস্টান আবার অরুণাচলেও কিছু চার্চকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং কিছু খ্রীস্টানকে হত্যা করা হয়েছিল।

রাজনীতিক স্বার্থে ধর্মীয় পীঠস্থানের অপব্যবহার ∫∫ রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অপব্যবহারের ঘটনাও ঘটে। এ ধরনের ঘটনাও সাম্প্রদায়িকতার আর একরকম অভিব্যক্তি। চার্চ এবং গুরুদ্বারাকে রাজনীতিক স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ঘটনা ভারতে ঘটেছে। অকালি দল তাদের রাজনীতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য মোর্চা গঠন ও প্রচারকার্য পরিচালনার কাজে পীঠস্থান হিসাবে স্বর্ণমন্দিরকে ব্যবহার করেছে। স্বর্ণমন্দিরের সুবৃহৎ চত্তরের একটি অংশ হল 'গুরু নানক নিবাস'। দাঙ্গাবাজ জঙ্গীরা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ আত্মগোপনের জন্য এই গুরুনানক নিবাসকে দুর্গ হিসাবে ব্যবহার করেছে। এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গী দাঙ্গাবাজদের মোকাবিলা করার জন্য ১৯৮৪ সালের জুন মাসে 'অপারেশন ব্লুস্টার' অনুসারে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এখানে অভিযান চালিয়েছে।

উপ-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ ∫∫ আবার ভারতের অধিকাংশ বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক অংশ বা উপ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত উপ-সম্প্রদায়ের মধ্যেও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে। এবং ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় এ জাতীয় দাঙ্গার ঘটনা কম ঘটেনি। লক্ষ্ণৌতে 'সিয়া' ও 'সুন্নীদের' মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের ব্যাপার বহুদিনের। তেমনি আবার কানপুর ও অমৃতসরে 'শিখ' ও 'নিরঙ্কারী'-দের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের ঘটনা অবিদিত নয়। পঞ্জাবে রাধাস্বামী উপ-সম্প্রদায়ের অনুগামী শিখ এবং গোঁড়া শিখদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী বা জনজাতিদের সঙ্গে অ-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরোধ বর্তমান। সিকিমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। এ কথা ঠিক। কিন্তু সিকিমের অধিবাসীরা 'লেপচা' ও 'ভুটিয়া' এই দুই পরস্পর বিরোধী জনগোষ্ঠীতে সংগঠিত।

প্রধানত হিন্দু-মুসলমানের বিরোধই ভারতের সাম্প্রদায়িকতা ∫∫ ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা বলতে প্রধানত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিবাদকে বোঝায়। এই বিভেদ-বিবাদকে প্রায়শই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হতে দেখা যায়। বিশেষত উত্তর ভারতে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অধিক সংখ্যায় ও মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান হল ভারতের দুটি বড় সম্প্রদায়। উত্তর ভারতের শহরাঞ্চলে এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক মাত্রাতিরিক্ত অবিশ্বাসের দ্বারা বিষাক্ত। তার ফলে এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষের মেরুকরণ ঘটেছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষ ভারতের সমাজজীবনে এবং রাজনীতিক ব্যবস্থায় অবাঞ্ছিত উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাধারণত শহরাঞ্চলের বিষয় ∫∫ ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রধানত শহরাঞ্চলেই সংঘটিত হতে দেখা যায়। সাধারণত নির্দিষ্ট একটি শহরে বা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। আধুনিককালের ভারতীয় শহরগুলিতে বহিরাগত বহু মানুষ সাময়িককালের জন্য এসে বসবাস করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এ রকম বহিরাগতদেরই অধিক সংখ্যায় জড়িয়ে পরতে দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব থাকলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সব সময়ই ঘটে না। দীর্ঘকালীন ব্যবধানে সাময়িককালের জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধতে দেখা যায়। সাধারণত একটি শহরে বা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সীমাবদ্ধ থাকে। এই কারণে সরকার পুলিশী বা সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অচিরেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাফল্যের সঙ্গে দমন করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বড় একটা বাধে না। কারণ গ্রামাঞ্চলের সমাজ-জীবনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কম-বেশী সদ্ভাব-সম্প্রীতি বর্তমান থাকে। গ্রামাঞ্চলের মুসলমান অধিবাসীরা সাধারণত সাম্প্রদায়িক প্রচারে বড় একটা কান দেয় না। ভারতের গ্রামাঞ্চলে এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ব্রিটিশ আমলেই সৃষ্টি হয়েছে। বলা হয় যে, এ ব্যাপারে ব্রিটিশদের উস্‌কানি ও প্ররোচনামূলক ভূমিকা ছিল। তাই ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষ ছিল সাধারণ ঘটনা যা বারে বারে বাধত। স্বাধীন ভারতেও এই ধারার বিরাম ঘটেনি। স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সংঘটিত হয়েছে। এই সংঘাত কখনো তীব্রতর হয়েছে, আবার কখনো বা অল্পেতেই থেমে গেছে। দু-একটি ছোট-খাট ও বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথা বাদ দিলে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে একটি দশক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিক থেকে শান্তিতে কেটেছে।

Scanned with CamScanner

কিন্তু অচিরেই এই সাম্প্রদায়িক শান্তি অন্তর্হিত হয়েছে। ১৯৬১ সালে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে এবং উত্তরপ্রদেশের আলিগড় সহ অন্যান্য শহরে মারাত্মক মাত্রায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। তারপর ১৯৬৪ সালে আবার মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এরপর বছর তিনেক সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল শান্ত। কিন্তু তারপর রাঁচিতে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষ শুরু হয় এবং অচিরেই তা বিহারের অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কালক্রমে ভারতের আরও কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ এবং কাশ্মীরেও এক সময় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চক্রাকার ধারায় এই ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা পরিলক্ষিত হয়। এবং প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে এই সময়কালের মধ্যে সর্বমোট এক হাজার একশ ছ'টি সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। তারপর সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা হ্রাস পেতে থাকে। এবং হ্রাস পাওয়ার এই প্রবণতা ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত বজায় থাকে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ রকম ঘটনার সংখ্যা ছিল ১৯৭২ সালে পাঁচ শ' একুশ এবং ১৯৭৬ সালে একশ' উনষাট। কিন্তু ১৯৭৭ সাল থেকে আবার সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই সময় সুদৃঢ় মতাদর্শগত বিশ্বাসের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে উঠতে দেখা যায়। এ রকম সাম্প্রদায়িক সংগঠন আর্থনীতিক সঙ্গতির বিচারে বিশেষভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে। এবং এ রকম সাম্প্রদায়িক সংগঠন জঙ্গি প্রকৃতির পরিচয় দিতে শুরু করে। বিংশ-শতাব্দীর আশির দশকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে উত্তেজনা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই সময় সাম্প্রদায়িক সংগঠন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সামিল হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চূড়ান্ত বিধ্বংসী অভিব্যক্তি ঘটে ১৯৯২ সালে। এই সময় বাবরি মসজিদ্ ভেঙে ফেলা হয়। এই ঘটনা ভারতে হিন্দু-মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে পুনরায় অতিমাত্রায় বিষাক্ত করে তোলে। এবং এই ঘটনা সর্বভারতীয় রাজনীতিকে বেশ কিছু দিনের জন্য নাড়া দিয়ে যায়।

ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলন // ভারতের রাজনীতিক কার্যপ্রক্রিয়ায় জাতিভেদ ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর্থনীতিক, রাজনীতিক ক্ষমতা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেরল বাদে দক্ষিণের অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলন বেশ জোরদার। তামিলনাড়ুতে ডি.এম.কে. দলের আন্দোলন অ-ব্রাহ্মণদের পক্ষে এবং ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে। তবে এই আন্দোলন ব্রাহ্মণ-বিরোধিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র হিন্দু সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এবং উত্তর ভারতের ভাষাগত ও আর্থনীতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশেও ব্রাহ্মণ-বিরোধিতা বিশেষভাবে বর্তমান। মহারাষ্ট্রেও ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলন আছে। এই সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ-সুবিধা এবং জনজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অ-ব্রাহ্মণদের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। এই ব্রাহ্মণ-বিরোধিতার কারণে ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে মেরুকরণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

অ-ব্রাহ্মণ জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ // ব্রাহ্মণ-অ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিরোধ ছাড়াও হিন্দু সমাজের উঁচু জাতি ও নিচু জাতির মধ্যেও বিরোধ আছে। হরিজন এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে গুরুতর দাঙ্গার উদাহরণ হিসাবে রামনাথপুরম দাঙ্গার কথা বলা যায়। কেরলে 'নায়ার' ও 'ইজ্হাভাস' এই দুই হিন্দু জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধিতা দীর্ঘদিনের। আবার কর্ণাটকে 'লিঙ্গায়েত' ও 'ওক্কালিঙ্গা'-দের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ সুবিদিত। অন্ধ্রপ্রদেশে দুটি অ-ব্রাহ্মণ বড় জাতিগোষ্ঠী হল 'কাম্মা' ও 'রেড্ডি'। এই 'কাম্মা' এবং 'রেড্ডি'-রাও পরস্পরের বিরোধী। আবার বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে হরিজনদের বিবাদ এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ অ-ব্রাহ্মণ জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যেও বিরোধিতা বর্তমান। এবং জাতিগত এই সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ধারণা ও চেতনার অভিব্যক্তি ঘটে।

সাম্প্রদায়িকতা ও তার প্রতিকূলতা // বর্তমান শতাব্দীর ভারতে অধিকাংশ বড় আকারের সমস্যাদির মূলে সাম্প্রদায়িকতার সংকট বর্তমান। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সাম্প্রদায়িকতা ভারতের জনজীবনে একটি দুরারোগ্য ব্যাধি হিসাবে দেখা দিয়েছে। মুসলিম লীগ মুসলমানের জন্য 'পাকিস্তান' নামে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানায়। এ দাবি মেনে নেওয়া হয়। এই দাবি মেনে নেওয়ার মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার প্রতি আত্মসমর্পণের সূত্রপাত ঘটে। সুতরাং স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। এই সাম্প্রদায়িকতা স্বাধীন ভারতে অধিকতর শক্তিধর হয়ে উঠেছে। ভারতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ—এই তিনটিই হল বড় জনসম্প্রদায়। এই তিনটি বড় জনসম্প্রদায়ের চরমপন্থী অংশের মৌলবাদী প্রবণতা ও মতান্ধতা সাম্প্রদায়িকতাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন অভিব্যক্তি ঘটে। এই ঘটনা শত-সহস্র পরিবারকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত করে। অসংখ্য মানুষকে অমানবিক দুঃখকষ্টের মধ্যে ঠেলে দেয়। সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে নিরাপত্তাহীনতার শিকারে পরিণত করে। ভারতে জাতিগঠনের পথে এই সাম্প্রদায়িকতা হল একটি বড় বাধা। আধুনিক ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক উন্নয়নের পথে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা

Scanned with CamScanner